বাংলার জন্ম এবং বাঙালি মুসলিমের বিকাশের ইতিহাস

বখতিয়ারের বাংলাদেশ

১ম খণ্ড

মনযূর আহমাদ

চেতনা
প্রকাশন

একথা সত্য...

এই গ্রন্থের নাম রেখেছি, 'বখতিয়ারের বাংলাদেশ'; মানে, এইদেশ বখতিয়ারের। কীভাবে, তা এই বই পাঠে উপলব্ধি করা যাবে। বখতিয়ার নিজ উদ্যোগে এইদেশ জয় করেছিলেন বলে ক্রমে এই ভূখণ্ড মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে ওঠে এবং সে নিজেকে উম্মাহ চেতনায় আলোকিত করে তোলে। এরই ধারাবাহিকতায় এখানের মৃতপ্রায় মানবতা ও মানবমণ্ডলী অল্প দিনে সারা হিন্দুস্তানে প্রতাপ অর্জন করে এবং সমৃদ্ধিতে সবাইকে ছাড়িয়ে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলেও বাঙ্গলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই মহাযাত্রার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হয়, ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে। মানে, প্রায় সাড়ে আটশত বছর আগে।

এই মহাযাত্রার আদ্যপান্ত তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে।

অনেকে বঙ্গ বিজয়ের ঘটনাকে আকস্মিক মনে করেন, কিন্তু এর ফসল ও ফলাফলকে নয়। রিয়াজুস সালাতিন, হিস্টরি অব বেঙ্গল, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, বাংলার ইতিহাস, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) প্রভৃতি গবেষণাধর্মী ইতিহাস গ্রন্থকে বাংলার মুসলিম শাসনের উপর মৌলিক গ্রন্থ ভাবা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আরো গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তবে প্রায় সবগুলোর চৌহদ্দি তবাকাতে নাসিরি থেকে যদুনাথ, রাখাল দাস, আর. সি. মজুমদার ও এম. এ. রহীম হয়ে আবদুল করিম। কিন্তু অনেক কথা তাদের রচনায় বিধৃত হয়নি। কীভাবে এই ভূখণ্ডটি একান্ত মুসলিমদের আবাস হয়ে উঠেছিল সেই আদর্শ, দর্শন ও চেতনার কথা বিস্তারিত আলাপে আসেনি। এখানের মুসলিমদের উম্মাহ চেতনাকে কখনোই মুখ্য রূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা

লক্ষ্য করা যায়নি। বরং এক শ্রেণির লোক পুরনো, ত্যাজ্য ও পরিত্যাক্ত পৌত্তলিক জাতিবাদিতা উস্কে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কীভাবে এই ভূখন্ডের জনমণ্ডলি উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অঙ্গ হয়ে উঠলেন, কোন আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্ধকার ছিন্ন করে তাওহিদের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার দুর্বার শক্তি দানে সম্মানিত করেছিল, কোন স্বপ্ন তাদের ইসলামের বাতায়নে সমর্পিত হতে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে তুলেছিল—আমরা প্রয়াসঃ এর মহিমা উচ্চকিত করার লোকের বড় অভাব উপলব্ধি করি।

এখানে ইসলাম প্রচারে, বিকাশে ও প্রতিষ্ঠায় যে সকল ত্যাগী সাধক ও বীরেরা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে এই মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে আছেন তাদের দাওয়াত ও মোকাবেলার ধরন, তাদের ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গের সুলুক আজো আমরা যথার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি।

বঙ্গ বিজয় প্রকৃত অর্থে এ দেশের ভূমিপুত্রদের একই সাথে সম্মান, অধিকার ও স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছিলো। আদি শাসনের শাসকদের ভেতর পালদের প্রজার প্রতি মমত্ববোধ ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে আগত জরবদখলদার সেন শাসকেরা ছিল আক্ষরিক অর্থেই শাসক। তাদের সময়ে জনগণ বিভেদের শিকার ছিল এবং তারা ছিল পীড়িত, বঞ্চিত ও শোসিত।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বিজয়ের ধারায় আজ আমরা সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক। সেই যে বঙ্গ বিজয়ের ধারা, সেটিই ছিল সুবে বাংলার অবয়বে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা—আজকের সার্বভৌম বাংলাদেশ—আমাদের গর্বের আবাস—স্বাধীন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা কি 'আক্রমণকারীকে' নিয়ে আহ্লাদ করছি, সাবাসী দিচ্ছি, বহিরাগতদের স্বাগত জানাচ্ছি! নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে এমন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। তিন দিকে ভারত, একদিকে সাগর এবং নাফ নদী—এর ভেতর মগ-চাকমা-ত্রিপুরা-অসমীয় ও মিজোদের মাঝে সতের কোটি মুসলিমের বসবাস। ওলিআল্লাহ, পীর-মাশায়েখ, আলিম-ওলামা, সুফি-সাধক-দরবেশদের পদধুলি এবং তাদের খুন ও ঘামে সিক্ত এ ভূখণ্ড বিধাতার দান। আমাদের এ এক পরম অর্জন।

একদিকে বারো আওলিয়া, শাহ আমানত ও বদর শাহ। একপ্রান্তে শাহজালা, অন্যপ্রান্তে শাহ মখদুম, দক্ষিণপ্রান্তে খান জাহান। এ তো কেবল আধ্যাত্মবাদের চারণভূমি নয়, আওলিয়াদের বিচরণক্ষেত্র নয়, পুণ্যাত্মাদের আবাসস্থল নয়, বিশ্ব মানচিত্রে ঠাঁই নেয়া তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। লোকজ ঐতিহ্য আর দেশজ আচারের সাথে তাওহিদের সাবলিল উচ্চারণে আমরা পেয়েছি স্বতন্ত্র জীবনবোধ, গড়ে তুলেছি এক আপন পরিমণ্ডল, যা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীদের জীবনাচার থেকে ভিন্ন। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ তাদেরকে পাশাপাশি অবস্থানের প্রেরণা জোগায়। তাই আমরা ধর্মের অনুসারী এবং অপরের ধর্মের প্রতি সহনশীল।

বিশ্বের দেশে দেশে ঐতিহ্য সন্ধান, শেকড়ের খোঁজ ও ইতিহাস চর্চার দুর্বার আকুতি আমাদেরও প্রেরণা জোগায়। নবাব সিরাজ আমাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতীক। তেমনি তিতু-শরিয়াতুল্লাসহ মহৎ প্রাণগুলো আমাদের নতুন করে সবক দেয়-

‘তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে খোদার মদদ ছাড়া
তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।’

মনযূর আহমাদ

আসকান ভিলা

(পূর্ব কদমলী ব্রিজ সংলগ্ন) মুন্সীবাগ।

১৪, ৯, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় পাঠক!

এটি আমাদের বাংলা ও ভারতের ইতিহাস সিরিজের চতুর্থ বই। এর 'সিন্ধু থেকে বঙ্গ' ও 'পলাশি থেকে ধানমণ্ডি' বই দুটি 'চেতনা' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বই দুটি পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং বোদ্ধা মহলেও সমান সমাদৃত হয়েছে। আশাকরি 'বখতিয়ারের বাংলাদেশ' আরো সাড়া জাগাবে ও আরো সমাদৃত হবে। কারণ, এ একান্তই আমাদের নিজস্ব ইতিহাস; নিজস্ব সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস- শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের গোড়ার ইতিহাস। দুঃখের বিষয়, ধর্মীয় মহলে- বিশেষত কওমি শিক্ষা পরিমণ্ডলে এই ইতিহাস খুব চর্চা হয়না। অনেকে জানেই না, বখতিয়ার কে? তিনি যে বিনাযুদ্ধে বঙ্গের রাজধানী নদীয়া জয় করেছিলেন এবং সেটি যে মাত্র আঠারোজনের একটি অভিযান ছিল এবং পরে সেই ইতিহাস যে কতভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, অবাস্তব ও কু-তথ্য যোগ করে সেই স্বর্ণালী ইতিহাসকে কতভাবে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষ বীর নায়কদের চরিত্র হনন করা হয়েছে- এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা তো নেয়া হয়-ই নি বরং এই যে এত গোলমাল- এর খবর কয়জনে রাখি!

আসলে এ সবের মধ্য দিয়ে একটি চক্র মুসলিম শাসনের সময়-কালকে ইতিহাস থেকে গায়েব করার চেষ্টাই করেছিল। তারা যে সফল হয়েছে, এর প্রমাণ, এই সময়ের ইতিহাস আমাদের চর্চা থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া। আমরা আরব-এশিয়া ও অফ্রিকার বহু খেলাফত ও সালতানাতের ইতিহাস পড়ি, সে ইতিহাসের বহু বিজয় ও বীরের ইতিহাস পড়ে শিহরিত হই, উজ্জীবিত হই, আপ্লুত হই; কিন্তু নিজ ভূখণ্ডের বিজয় ও বীরদের ইতিহাস

জানিনা, পড়ি না, বিশ্লেষণ ও রচনা করার উদ্যোগ তো পরের কথা! উপরন্তু, এই ইতিহাসের বড় অংশটি যে আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও সুফি-সাধকদের অবদানে গৌরবান্বিত, তাদের তালিম-তবরিয়ত ও জিহাদ-মুজাহাদায় আলোকিত, তাও কি আমরা জানব না!

এই বোধ থেকে এবারের আমাদের এই প্রকাশনা।

এই যে শিকড় ভুলে গিয়ে নিজ ভূমিতে নিজেকে অপর করে তোলার প্রবণতা এবং সত্যিকার মুসলিম পরিচয়ে রাষ্ট্র-রাজনীতিতে নিজেকে প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য করে তোলার যে সময়ের তাগাদা, এর সুলুক উৎপন্ন করবে তো এই ইতিহাস-ই তো, নাকি!

আমরা এই তাগিদ থেকে এবার পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি বঙ্গের প্রায়-পৌনে ছয় শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ ইতিহাস মুসলিম বাঙালি জাতি নির্মাণের ইতিহাস। যে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে আছে আমার ও আপনার পরিচয়। সেই পরিচয় তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

সকল পাঠকের ইহ-পরকালীন মঙ্গল ও সাফল্য কামনায়-

খুরশিদ আলম আমজাদী

চেয়ারম্যান, চেতনা প্রকাশন

বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৫, ৯, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সূচি

- প্রথম প্রহর|২১
- শুভ সূচনা | ৩০
- চর্যাপদ দুর্বোধ্য হওয়ার কারণ |৩৫
- অবহেলিত বখতিয়ার|৩৯
- সভ্যতার নতুন বুনিয়াদ|৪০
- জ্ঞান-দীপালোকের প্রথম প্রজ্বলন|৪১
- আসমানি আশীর্বাদ|৪৩
- বঙ্গের রূপান্তর|৪৯
- বঙ্গ বিষয়ক প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ |৫১

অধ্যায় : ১

- বাঙালির উদ্ভব ও বিকাশ | ৫৯
- মানবসভ্যতার বয়স | ৬১
- সভ্যতার বংশলতিকা | ৬২
- আর্য কারা! | ৬৪
- ভারতের আদি অধিবাসী দ্রাবিড় |৬৬

পরিচ্ছেদ-১

- শিকড়ের গভীরে | ৮৩
- বাংলা-পাক-ভারতে প্রথম মানব বসতি| ৮৩
- প্রত্ন প্রস্তর যুগ | ৮৩
- নব্য প্রস্তর যুগ | ৮৫
- তাম্র যুগ | ৮৭
- ব্রোঞ্জ যুগ | ৮৮

পরিচ্ছেদ-২

- বঙ্গ ও বাংলা নামের ইতিকথা | ৯১
- খ্রিষ্টপূর্বে বঙ্গ ও বাংলা নাম | ৯৬

পরিচ্ছেদ-৩

- কারা বাংলার প্রাচীন অধিবাসী | ৯৯
- সৌরসেনি অর্থাৎ সেরাসেনি বা শেরিসাভুনি | ১১১
- উপজাতিরা বাংলাদেশের আদিবাসী? | ১১৪
- মহেঞ্জোদারো'র অর্থ কী? | ১১৭
- হরোপ্পা'র অর্থ কী? | ১২১
- বাঙালি কি মূলত দ্রাবিড়? | ১২৫
- দ্রাবিড় নয়, মূল আরব বসতির প্রমাণ | ১২৮
- যবন-এর মূল কী? | ১২৯
- দ্রাবিড় : আরব ও আফ্রিকীয় মিশ্র জাতি | ১৩২
- বাঙালি একটি স্বতন্ত্র নৃ-জাতি | ১৩৩
- বাংলায় আরবি শব্দ ব্যবহারের সূচনাকাল | ১৩৫

পরিচ্ছেদ-৪

- বঙ্গ ভারতের অঙ্গ নয় | ১৪০
- অখণ্ড ভারত (!) | ১৪১

পরিচ্ছেদ-৫

- ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্ত নাম ভিত্তিহীন | ১৪৩
- 'আর্য' শব্দের প্রথম ব্যবহার করেন কে? | ১৪৩

পরিচ্ছেদ-৬

- বাংলা নাম শব্দের উৎপত্তি | ১৪৮
- বাংলা ভাষার বর্ণও সেমিটিক উদ্ভূত | ১৫৩
- আরবি ভাষার পরিচয় | ১৫৮

পরিচ্ছেদ-৭

- সব ভাষা ডান দিক থেকে লেখা হতো | ১৬৫
- বাংলা ভাষার মূল আরবি | ১৭২
- বাংলা ভাষার শত্রু-মিত্র | ১৭৬
- সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় উজ্জীবিত বাংলা ভাষা | ১৭৯
- জাতীয়তার প্রধান নিদর্শন ভাষা | ১৮০

অধ্যায়-২

- বাঙালি মুসলিমের নৃ-পরিচয় | ১৯২
- রিজলের বক্তব্য | ১৯৪
- রিজলের বক্তব্যের প্রতিবাদ | ১৯৫
- ফজলে রাব্বির মত | ১৯৬
- আসল সত্য | ১৯৮
- বৌদ্ধদের ইসলাম গ্রহণ | ১৯৯
- তুর্কি প্রভাব | ২০০
- কেন এমন হলো! | ২০১
- মুঘলদের ইসলাম গ্রহণের কাল | ২০২
- আরব আগমন | ২০৪

পরিচ্ছেদ-১

- বাঙালি মুসলিম মানসের রূপরেখা ও রাষ্ট্র-চেতনা | ২০৯
- বাঙালির একাংশের নতুন রূপ | ২১০
- রাজনীতির ভিন্ন ধারার সূচনা | ২১১
- আরবে ওয়াহাবি অভ্যুত্থান | ২১৩
- হাজি শরিয়াতুল্লাহর আগমন | ২১৩
- তিতুমীরের আবির্ভাব | ২১৪
- সিপাহি ও নীল বিদ্রোহ | ২১৫
- বাংলার নবজাগরণ | ২১৬
- ‘ফিরিঙ্গি’ সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা | ২১৭
- বাংলা ভাষা আন্দোলন | ২১৮

- বাংলার সমাজজীবনে ইসলাম| ২২০
- ইসলামের বিশেষত্ব |২২১
- মুসলিম ও হিন্দু সমাজ-সম্বন্ধ এবং এক বছরে ৮৫০ সহমরণ | ২২২
- ইউরোপের অভিঘাত ও নব্য চিন্তার উন্মেষ | ২২৩
- ইউরোপে ডাইনিকে পুড়িয়ে মারার আইন! | ২২৪
- লোকবিশ্বাস | ২২৬
- মরমিবাদ | ২২৭

পরিচ্ছেদ-২

- বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে মুসলিম উপাদান | ২৩৩
- বাংলাদেশে ইসলামি শিল্পকলা |২৩৬
- বাংলার সমাজ-মানসে আরবি ও তুরানিদের প্রভাব ২৩৭
- পোড়া মাটির নকশা |২৪০
- বাঁশের শৈলী | ২৪২
- বাংলার মসজিদ স্থাপত্য | ২৪৪
- শিল্প ও রাজশক্তি | ২৪৬

অধ্যায়-৩

- বাংলার ভূগোল বাংলার বৈচিত্র্য | ২৪৯
- প্রাকৃতিক সীমারেখা ও যোগাযোগ পথ | ২৪৯
- প্রাকৃতিক গঠন বৈচিত্র্য | ২৫২
- প্রকৃতি ও জলবায়ু | ২৬৩
- রাজনীতিতে প্রকৃতির প্রভাব | ২৬৮
- প্রথম নৌবাহিনী গঠন | ২৬৯
- বাংলার প্রতি শের শাহের আগ্রহ ও উপলব্ধি | ২৭০

অধ্যায়-৪

- বাংলার অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি | ২৭৪

পরিচ্ছেদ-১

- কৃষিতে উন্নতি | ২৭৬
- মাটির উর্বরতা | ২৭৬
- চাল | ২৭৭
- তুলা | ২৭৭
- লাক্ষা | ২৭৭
- পাট | ২৭৮
- গুটি পোকার চাষ | ২৭৮
- খনিজ সম্পদ | ২৭৯

পরিচ্ছেদ-২

- শিল্প-কারখানা | ২৮০
- বস্ত্রশিল্প | ২৮০
- চিনিশিল্প | ২৮২
- জাহাজ নির্মাণ শিল্প | ২৮৪

পরিচ্ছেদ-৩

- বাণিজ্য | ২৮৭

পরিচ্ছেদ-৪

- বাংলার বিত্ত-সম্পদ | ২৯২
- 'বাংলায় প্রবেশের শত দরজা খোলা কিন্তু ফেরার দরজা নেই।' ২৯২
- ব্যাংক-ব্যবস্থা | ২৯৩
- সহজ ও সুলভ জীবনযাত্রা | ২৯৪

অধ্যায়-৫

- জাতি-পরিচয়ে বাঙালি মুসলিমের উন্মেষ | ২৯৯
- জাতি-পরিচয়ে বাঙালি | ৩০২
- পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের বাঙালি হওয়ার দাবি | ৩০৩
- কারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল? | ৩০৯

▸ মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাঙালির ধর্ম | ৩০৯
▸ বাংলায় মন্দিরের অবশেষ নেই, কেন? | ৩১২
▸ ইটনের বিশ্লেষণ | ৩১৩
▸ বখতিয়ার : এক আশ্চর্য নায়ক | ৩১৮
▸ তুর্কিরা আসার আগে বাংলায় কি
▸ সাহিত্যের কোনো সচল ধারা ছিল? | ৩২০
▸ বাংলা 'সোনার বাংলার' রূপ পায় সুলতানি আমলেই | ৩২১
▸ ১৬৪০ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা | ৩২৩

অধ্যায়-৬

▸ বাংলায় ইসলামের প্রবেশ : | ৩৪৬
▸ জলপথ ৩৪৬
▸ মালদ্বীপে বাঙালি মুসলিম রাজা | ৩৪৯
▸ উত্তরবঙ্গ যেভাবে 'বরেন্দ্র' হয়ে ওঠে | ৩৪৯
▸ নদীয়া জয়ের ৩০০ বছর পূর্বে ঢাকায় ইসলাম প্রচার | ৩৫২

পরিচ্ছেদ-১

▸ বাংলায় ইসলামের প্রবেশ : স্থল পথ | ৩৫৮

অধ্যায়-৭

▸ বাংলায় আরবদের আগমন ও বসতি স্থাপন | ৩৬৩

অধ্যায়-৮

▸ বাংলায় মুসলিম সমাজ নির্মাণে পীর-মাশায়েখের অবদান | ৩৭৬
▸ বাংলায় সুফিবোধ ও তাসাউফ চর্চা | ৩৭৬
▸ সুফি তরিকার বিস্তার | ৩৭৮
▸ শাসন-বলয়ে পীরদের প্রভাব | ৩৭৯

পরিচ্ছেদ-১

- বাংলায় ইসলাম প্রচার :
  [প্রথম স্তর]
  (একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) | ৩৮৪
- শাহ সুলতান বলখি মাহিসাওয়ার
  (আগমনের সম্ভাব্য সময়: ১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) | ৩৮৪
- শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমি (আগমন কাল : ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) | ৩৮৮
- বাবা আদম শহীদ (আগমন কাল : ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) | ৩৮৯
- জালালুদ্দিন তাবরিজি (আগমনের সম্ভাব্য তারিখ :
- ১২১৬ খ্রিষ্টাব্দের পর এবং সম্ভাব্য মৃত্যু : ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) | ৩৯৫
- মখদুম শাহদৌলা শহীদ (আগমন : ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪০৬
- শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশেকেন | ৪০৮
- মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবি (১১৬৯-১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪০৮
- শাহ মখদুম রূপোশ (১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) | ৩১২
- বায়েজিদ বোস্তামি (১১৭৭ থেকে ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪১৪
- ফরিদুদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৭ থেকে ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪১৬

পরিচ্ছেদ-২

- ইসলাম প্রচারের যৌবনকাল | ৪১৯
- [দ্বিতীয় স্তর]
  (ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও চতুর্দশ শতাব্দী)
- শাহ তুরকান শহীদ (ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) | ৪১৯
- মওলানা তকিউদ্দিন আরাবি (ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধ) | ৪২০
- শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামাহ
  (সম্ভাব্য আগমন : ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪১২
- বাংলার প্রথম মুহাদ্দিস | ৪২৪
- আবু তাওয়ামার আগমন | ৪২৬
- ইলমে হাদিসের শিক্ষা শুরু | ৪২৬
- শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরির দায়িত্ব পালন | ৪২৮
- শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরি (জন্ম : ১২৬২ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৩০

- শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানি (১৩ শতকের সাধক) | ৪৩২
- আমির খান লোহানি (১৩ শতকের সাধক) | ৪৩৩
- শাহ সুফি শহীদ (আগমন : ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৩৩
- উলুগে আজম জাফর খাঁ গাজি (মৃত্যু : ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৩৪
- পীর বদরুদ্দিন (১৩ শতকের সাধক) | ৪৩৫
- সাইয়েদ আব্বাস আলি মক্কি ও রওশন আরা (আগমন : ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৩৬
- তাপসী রওশন আরা (আগমন : ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু : ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৩৭
- শাহ বদরুদ্দিন আল্লামা (আগমন : ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৩৭
- কাতাল পীর (চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী) | ৪৪০
- শাহ জালাল মুজাররাদ (আগমন : ১৩০৩, মৃত্যু : ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৪১
- সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ (১৩-১৪ শতক) | ৪৪৯
- বড় খাঁ গাজি (১৪ শতক) | ৪৫০
- সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন শাহ নেকমর্দান (১৩-১৪ শতক) | ৪৫১
- সাইয়েদ রেজা বিয়াবানি (১৪ শতক) | ৪৫২
- মওলানা আতা (১৩০০-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৫৩
- শায়খ আখি সিরাজুদ্দিন (মৃত্যু : ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৫৩
- শাহ মালেক ইয়েমেনি (১৪ শতক) | ৪৫৫
- সাইয়েদ হাফেজ মওলানা আহমদ তানুরি (১৪ শতক) | ৪৫৫
- শায়খ বখতিয়ার মাইসুর (১৪ শতক) | ৪৫৬
- মখদুম শাহ জালালুদ্দিন জাঁহা-গাশ্‌ত বোখারি (১৪ শতক) | ৪৫৬
- শায়খ বখতিয়ার মাইসুর (১৪ শতক) | ৪৫৭
- রাস্‌তি শাহ (১৪ শতক) | ৪৫৭
- শাহ মুহাম্মদ বাগদাদি (১৪ শতক) | ৪৫৭
- সাইয়েদুল আরেফিন (১৪ শতক) | ৪৫৮
- শাহ লঙ্গর (১৪ শতক) | ৪৫৮
- শাহ মুহসিন আউলিয়া (১৪ শতক) | ৪৫৯
- শায়খ আলাউদ্দিন আলাউল হক (১৩০১-১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৫৯

পরিচ্ছেদ-৩

- বঙ্গে ইসলাম প্রচার | ৪৬৪
- [তৃতীয় স্তর]
  (পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী)
- শাহ নুর কুতবুল আলম (১৩৫০ [সম্ভাব্য]-১৪৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৬৪
- শায়খ আনওয়ার শহীদ ও শায়খ জাহিদ
  (শাহাদাত : ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে। মৃত্যু : ১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৭০
- শায়খ জয়নুদ্দিন বাগদাদি ও চেহেল গাজি
  (সম্ভাব্য আগমন : ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৭১
- মীর সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানি
  (জন্ম : ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু : ১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দ | ৪৭২
- শায়খ হোসাইন জুক্কার পোশ | ৪৭৩
- শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ | ৪৭৪
- শাহ ইসমাইল গাজি (মৃত্যু : ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৭৫
- হজরত খান জাহান আলি (মৃত্যু : ১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৭৭
- বদরুদ্দিন বদরে আলম জাহিদি (মৃত্যু : ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৮৩
- মওলানা বরখুরদার (মৃত্যু : ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে) | ৩৮৩
- শাহ মজলিস (পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ) | ৩৮৩
- বাবা আদম | ৪৮৫
- শাহ মান্নাহ্ (মৃত্যু : ১৪৮৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে) | ৪৮৫
- শাহ জালাল দক্ষিণী (সম্ভাব্য মৃত্যু : ১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৮৬
- শায়খ হুসামুদ্দিন মানিকপুরি (মৃত্যু : ১৪৭৭) | ৪৮৭
- শাহ সুলতান আনসারি ও শাহ আবদুল্লাহ গুজরাটি
  (আগমন : ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ) | ৪৮৮
- হাজি বাবা সালেহ (মৃত্যু : ১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৮৮
- মখদুম শাহ জহিরুদ্দিন | ৪৮৯
- মুবারক গাজি | ৪৮৯
- একদিল শাহ ও অন্যরা (সম্ভাব্য আগমন : ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৯০
- শাহ মুয়াজ্জাম দানেশমন্দ (১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৯১

- শাহ আলি বাগদাদি
  (আগমন : ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ। মৃত্যু : ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ) | ৪৯১
- শায়খ জালাল হালবি (আগমন : ১৫০৫, মৃত্যু : ১৫৩৭) | ৪৯৩
- শাহ আদম কাশ্মীরি ও শাহ জামাল | ৪৯৩
- শাহ চাঁদ আউলিয়া | ৪৯৪
- হাজি বাহরাম সাকা (মৃত্যু : ১৫৬২) | ৪৯৫
- খাজা চিশতি বেহেশতি (মৃত্যু : ১৫৮৯) | ৪৯৫
- শাহপীর (মৃত্যু : ১৬৩২) | ৪৯৬
- কাজি মুওয়াকিল | ৪৯৬
- শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ (মৃত্যু : ১৬৬৪) | ৪৯৮
- খাজা আনওয়ার শাহ শহীদ(মৃত্যু : ১৭১৫) | ৪৯৯
- সাইয়েদ আবদুল খালেক বোখারি | ৪৯৯
- মওলানা শাহ আবদুর রহিম শহীদ (১৬৬৩-১৭৪৫) | ৪৯৯

প্রথম প্রহর

১৯৯৭ সনে বঙ্গ বিজয়ের ৭৯৩তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বলেছিলেন :

আজকের সেমিনারের উদ্দেশ্য ইতিহাসকে জানা, ইতিহাসের সত্য সামনে তুলে ধরা এবং ইতিহাস অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। অনেক সময় অনেক দেশ দুর্ভাগ্যের শিকার হয়, অনেক দেশে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী ইতিহাস সম্পূর্ণ মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইতিহাস কখনো মুছে ফেলা যায় না। বুলগেরিয়ায় ওসমানীয় তুর্কিরা পাঁচশত বছর রাজত্ব করেছিল, আমি বুলগেরিয়ায় গিয়ে বিভিন্ন আর্কাইভে অনুসন্ধান করে দেখেছি, তাদের সাহিত্য-রচনা থেকে ঐ পাঁচশ' বছরের ইতিহাস গায়েব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের এই পাঁচশ' বছর কোথায় গেল?

বলল, 'পাঁচশ বছর আমরা সংহার করেছি।'

বললাম : সে তো মারাত্মক কথা, কিন্তু আপনাদের খাদ্যে, স্বভাবে, আপনাদের ভাষায়—এসব কিছুতে তো ওসমানীয় তুর্কিরা বিদ্যমান রয়েছে, সেটা আপনারা খেয়াল করেন না!'

বলল : 'কীরকম!'

আমি বললাম, 'আপনারা কাবাব বলেন, আপনারা হালুয়া বলেন, এগুলো তো তুর্কি শব্দ।'

আমি বুলগেরিয়ার দোকানের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা দেখেছি 'হালুয়া'। ভিতরে গিয়ে দেখেছি, সত্যিই তারা আশ্চর্য স্বাদের হালুয়া তৈরি করে। সে হালুয়ার দোকানগুলোর পাশেই মসজিদ ও কবরস্তান। সেখানে বহু আল্লাহর অলির কবর রয়েছে।

শ্রমিকদের দেখলাম, সেই কবরগুলোর সামনে তারা খাবার রেখে একটু বিশ্রাম নিল। তারপর খাবার নিয়ে চলে গেল।

আমি গাইডকে বললাম : 'এটা ওরা কী করল!'

আমার গাইড বলল, 'না ওটা ওরা এমনিই করে। তারা এখানে বিশ্রাম করেছে।'

আমি বললাম : 'না, আমি অনেকবার দেখেছি এরা কবরস্তানে এসে অলি আল্লাহদের কবরের পাশে খাবার নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তারপর সেগুলো বাড়িতে নিয়ে যায়—সেটা যথার্থ হোক বা না হোক, কিন্তু এটা তারা করে। এই প্রথা অনেক দেশে আছে।

আমি ওদের বললাম, তোমরা ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করেছ, কিন্তু তোমাদের ভাষায়, তোমাদের খাবারে, স্বভাবে ও তোমাদের আচরণে ওসমানীয় তুর্কিদের সাক্ষর এখনও বেঁচে আছে।

সুতরাং ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। ভারতবর্ষে মুসলিমরা এসেছে। মুসলিমরা এ দেশ শাসন করেছে, এ ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। ইতিহাস অস্বীকার করার প্রবণতা কোনো জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ এসেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সব সময়ই ওরা বলেছে : 'ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি বহিরাগত।' তারা বলেছে, বহিরাগত একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে অন্ধকার যুগের সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘকাল ধরে এই অন্ধকার যুগের কথাই বলা হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশেও যারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, তারাও একে অন্ধকার যুগ বলেছেন। শুধু তা-ই নয়। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের বিরাট বই—তাতে বলা হয়েছে, শ্রীচৈতন্য এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই সৃষ্টি হতো না।

এভাবে তারা প্রকৃত ইতিহাস অস্বীকার করছে। আমরা এতই হীনম্মন্য হয়ে পড়েছি যে আমরা নিজেদের ইতিহাসকে বিকৃত করছি। আসলে বখতিয়ার খিলজির এ দেশে আগমনের পরেই বাংলা সাহিত্য এবং তৎকালীন বঙ্গ সারা পৃথিবীর নিকট পরিচিতি লাভ করেছিল।

আসলে বহিরাগত কারা? বহিরাগত কর্ণাটকের ব্রাহ্মণরা, সেনরা। সেনরা এসেছিল পাল রাজাদের পরাজিত করে।

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, পাল রাজারা ছিলেন বাংলাদেশের মানুষ। তারা সাড়ে চারশ বছর এ দেশে রাজত্ব করেছে এবং তারা এই বাংলাদেশের সুনাম দেশে-বিদেশে পৌঁছে দিয়েছে—তিব্বতে পৌঁছে দিয়েছে, চীনে পৌঁছে দিয়েছে। সেনরা এদের হটিয়ে এই দেশ দখল করেছিল।

সেনরা এ দেশে জাতিভেদ সৃষ্টি করেছিল। তখন ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ানোও নিষিদ্ধ ছিল। অ-ব্রাহ্মণদের নগরীতে বাসগৃহ নির্মাণের কোনো অধিকার ছিল না, দিনের বেলা চলাচলেরও অধিকার ছিল না। শুধু তা-ই নয়, বৌদ্ধরা যে শত শত বিহার নির্মাণ করেছিল, সেসব বিহার সেনরা ধ্বংস করেছিলো—সে সব বিহারের উপর তারা মন্দির নির্মাণ করেছিল। সেনরা একটা জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কর্ণাটকের বর্ণবাদী সেনরা এ দেশের লোক নয়। এরা অপভ্রংশ ভাষা পরিবর্তন করে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন করেছিল। আমাদের ইতিহাস বলে, সাড়ে চারশ' বছর পালরা এ দেশে রাজত্ব করেছিল। সেনরা আশি কি একশ ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিল। এর বেশি নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে—বাংলাদেশে এখন সেনদের গৌরবগাথা উচ্চারিত হয়। পালদের কথা মুখেও আনা হয় না। এ রকম কথা বলা হয় যে, নূতন ভাব প্রকল্প, কবিতার নূতন আবেদন সেনরাই এনেছিল। এই যে ওসাপতিধর, ধোয়া, জয়দেব এরা নূতন ভাব প্রকল্প এনেছিল। কিন্তু তাদেরই লেখক বঙ্কিম চন্দ্র বলছেন, 'বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা এনে বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন জয়দেব'। সেনদের অত্যাচারে এ দেশের মানুষ বৌদ্ধ, ভোস, চামার বা মুচি হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই যে দুরবস্থা, এ

দুরবস্থার ফলে নির্যাতিত, দরিদ্র নিপীড়িত, নিরুৎসাহিত মানুষগুলো এ দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে গেল।

সুকুমার সেন দেশ পত্রিকার একটি সংখ্যায় লিখেছিলেন, 'ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজি অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। এ দেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং নগর দুর্গের লৌহ কপাট খুলে দিয়েছিলেন, অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়েই বখতিয়ার প্রবেশ করলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন তখন খেতে বসেছিলেন। যখন তিনি শুনলেন, তুর্কিরা এসেছে। তিনি হাত না ধুয়েই পেছন দরোজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। পূর্ব বঙ্গের দিকে চলে গেলেন। এ নিয়ে ডি. এল. রায় একটি ব্যঙ্গ ছড়া লিখলেন।'

ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার এলেন বলে এ দেশের জাতিভেদ প্রথা দূরীভূত হলো। তখন থেকে ব্রাহ্মণরা শূদ্র হয়েছে এবং শূদ্ররা ব্রাহ্মণ হয়েছে। ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণত্ব পরিহার করে শূদ্র রমণীর পাণি গ্রহণ করেছে। শূদ্ররাও জ্ঞানে-গরিমায় উন্নতি করে ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ করেছে। ডোম, চাঁড়াল, ব্রাহ্মণদের মিলন সাধন হয়েছিল। এক অসাধারণ বিপ্লব বাঙালির জীবনে সম্পাদিত হলো। এই পরিবর্তন না এলে মানুষের জীবন ও ভাগ্যের পরিবর্তন হতো না।

তখন নূতন স্থাপত্য শিল্পের আবির্ভাব হলো। বৌদ্ধদের বিহার ও হিন্দুদের মন্দির উভয়ের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে যে বিষয়টি লক্ষ করা যায়, তা হলো, আল্লাহর দেওয়া আলো-বাতাস থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা। তারা লোকদের বৈরাগ্য বা সংসার থেকে মুক্তির মাহাত্ম্য শোনাত।

বখতিয়ার খিলজির আগমনের পর নূতন স্থাপত্য রীতিতে বাইরের আলো-বাতাসের সাথে মানুষের যোগাযোগ স্থাপিত হলো। আলো-বাতাস অবাধ প্রবেশের সুযোগ রেখে মসজিদ গড়ে উঠত। মসজিদে নামাজের সময় স্থান সংকুলান না হলে মানুষ বাইরেও নামাজে দাঁড়ায়। মন্দিরে কখনো এমন হয় না। এই যে একটা ব্যাপার, এটা সম্ভব হয় স্থাপত্য কৌশলের কারণে। এ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাইরের পরিসর ভেতরের পরিসরের সাথে মিশে যাবে। রাস্তা ও মসজিদের প্রথম চত্বর এবং মসজিদের অভ্যন্তর—এর মধ্যে কোনো তফাত রাখা হয় না। এই স্থাপত্য

রীতি আজো পালিত হচ্ছে। যেমন আধুনিক বাড়ি বাইর থেকে খানিক গৃহের ভেতর প্রবেশ করে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার বা ড্রইং রুমের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি নির্মাণের প্রচলন মুসলিম স্থাপত্য রীতি থেকেই এসেছে। মুসলিম শাসকরা এভাবেই জনমণ্ডলীর জীবনেও ঐশী আলো প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

মুসলিমরা যে দেশে গিয়েছে, সে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি তারা লালন করেছে। স্পেনে গিয়েছে—স্পেনীয় ভাষা প্রতিপালন করেছে। চীনে গিয়েছে—চৈনিক ভাষা প্রতিপালন করেছে। তারা এর মাধ্যমে সত্য প্রচার করেছে। সিন্ধু গিয়েছে, বুখারিস্তান গিয়েছে—সে দেশের ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছে। বাংলাদেশে এসেছে—এখানকার ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বৌদ্ধদের বলেছে, তোমাদের যে ধর্মগ্রন্থ আছে সংস্কৃত থেকে তা নিজের ভাষায় অনুবাদ করো। মুসলিমরা এ পরামর্শ দিয়েছে। হিন্দুরা তা দেয়নি।

এর আগে এ দেশের সংস্কৃতি বেশ উন্মুক্ত ছিল—বটতলায়, পর্বতের শালদেশে চর্চিত হতো। হিন্দুরা এসে তাদের সংস্কৃতি মতে সেসব মন্দিরের মধ্যে বন্দি করল। শুধু মানুষকে মন্দিরের মধ্যে বন্দি করল না বরং তারা রাজদরবারের চার দেয়ালের ভেতর সাহিত্যও বন্দি করল। তারা বলল, সংস্কৃতি ব্রাহ্মণদের জন্য, সাধারণ মানুষের কোনো সংস্কৃতি থাকে না।

বখতিয়ার খিলজি সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি তুলে ধরলেন। এ দেশে আরবি-ফারসি ভাষা এলো, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হলো। মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু হিন্দুদের যে টোল, তা বহাল রাখা হলো। হিন্দুদের সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত থাকল। শুধু তা-ই নয়, তারা রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। এই যে পরিবর্তন, সে পরিবর্তন আশ্চর্যজনক। আজকের দিনে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

সেনরা বৌদ্ধ স্তূপ ধ্বংস করেছে। মুসলিমরা এসে মন্দির ধ্বংস করতে পারত, তা তো করেনি। মুসলিমরা সেগুলো রক্ষা করেছে। বরং বৌদ্ধ স্তূপগুলো আবার নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সহায়তা করেছে। যেখানে